বৃক্ষের বেড়ে ওঠা

অমর মিত্র

গল্প লেখার গল্প বিশেষ কিছু নেই। আমার বেড়ে ওঠা, আমার জীবনযাপন আমার সঙ্গী সাথী, আমার বাসস্থান, সব কিছুই তো গল্পের উৎস। গল্পলেখার কোন আগাম ছকে আমি বিশ্বাস করিনা। কোন একটি মুহূর্ত, বিশেষ একটি বাক্য, কোন এক মানুষের মুখ -- এগুলি যেন স্ফুলিঙ্গের মত কাজ করে আমার ভিতরে। লটানা পৃষ্ঠার সামনে কলম নিয়ে আঁচড় কাটতে বসি। আমার মাথায় তখন আপাতভাবে কোন কিছুই যেন নেই। গল্পটি তবু হয়ে যায়। হয়ে যাবে এই বিশ্বাস নিয়ে বসি কারণ আমার প্রাত্যহিক জীবন তো অবচেতনে গল্পের হীরকবিন্দুগুলি প্রতি মুহূর্তে নির্মাণ করে চলেছে। যা ভাবিনি সেই মুহূর্তে, যে ঘটনা হয়ত পাঁচ বছর আগে দেখা, তা গল্পে শরীর হয়ে ফিরে আসে আবার।

দে-গঙ্গার মাঠ খসড়া হচ্ছে। জমির খতিয়ান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমিন বাবু সঙ্গে। দুই মধ্যবয়স্ক মুসলমান চাষীর জমি নিয়ে খুব গোলমাল। শেষে আমাকে ধরে বলল, দু'টো দিন সময় দেন, ভাবী দলিল লিয়ে চলে গেছে হাড়োয়ায়, আমরা লিয়ে আসি, তখন দ্যাখবেন জমিন আমাদের কী না।

ভাবীর এটি তৃতীয় বিবাহ, কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল। আমি গল্পলেখার জন্য তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। কথা বলতে বলতে গ্রাম্যমানুষের বুকের দরজা খুলে যায়, বেরিয়ে আসা হা হা শূন্যতাবাহী এক দিগন্ত বিস্তারী নদী। ঘর সংসারের সব বলে ফেলতে পারলে যেন তাঁরা বাঁচেন।

প্রায় বছর খানেক বাদে হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদাতে মেলা দেখার পর নদী পার হয়ে ওপার থেকে একানববই বাস ধরে তিন ঘন্টায় শ্যামবাজার। সেদিন রাত জেগে 'হস্তান্তর' গল্পটি লিখি। জমি হস্তান্তরের বহু দৃশ্যই তো দেখেছি, দেখতে হয়। দেখেছি জুরো রোগী উঠোনে বসে ধান ঝাড়ছে ---পৌষমাসের সকালে। খুব সামান্য জমি তার। এসব ঢুকে গেল হস্তান্তরে। অনেক দৃশ্য, অনেক বেদনা এক হয়ে গেল এখানে। ছক বাঁধিনি। গল্পের ছক বাঁধা যায় বলে জানিনা। হস্তান্তরের নানান দলিল সোলেনামা দানপত্র, হেজনামা, না দাবী দেখতে দেখতেই 'দানপত্র'র উৎপত্তি। তার আগে গোপীবল্লভপুরে দেখেছিলাম পুষানুত্রমে যে আদিবাসী চাষী জমি চষছে, সে জমি কবে সরকারে বর্তে গেল তা জানল না। কবে তার পাট্টা হয়ে গেল তা জানে না। পাট্টার নীল কাগজ নিয়ে জমির দখল নিতে এলেন অবস্থাপন্ন ভূস্বামী। মাঠ জরিপে তার খুব বিত্রম। জরিপ পার্টিকে খাওয়াবেনই,তার পাট্টার দখল না থাকলেও রেকর্ড করাবেন। আদিবাসীরা কাগজ জানে না, জমি জানে। আর জানে জমির নাম। একটা ব্যাপার খুব লক্ষ্য করার, যে জমি এখন মহাপাত্রদের তার নাম ধারো পরিষ্কার হয়ে যায় চোখের সামনে। গরীব চাষী উচ্ছেদ হয়ে গেলেও, তার নামটি উচ্ছেদ করতে পারেনি কেউ জমি থেকে। শত বছরের দুইশত তিনশত বছরের জমির ইতিহাস এ থেকে খুব প্রাঞ্জল হয়ে যায়। এসব ভাবতে ভাবতে কয়েক বছর বাদে, তখন আমি গোপীবল্লভপুর ছেড়ে, কুলটিকারি ছেলে হলদিয়া হয়ে দীঘায়। 'দানপত্র' গল্পটি একটি লটানা কাগজে কলমের আঁচড় কাটতে কাটতে হয়ে গেল। তার আঙ্গিকটি শুধু মাথায় ঘুরছিল, দলিল যেভাবে লেখা হয়। দলিল লেখক তো দলিলে জমির হস্তান্তরের সামান্য সূত্র বর্ণনা করেন। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম গল্পটি লেখার আগে। পরপর দুটি, একটি 'অনীক' -এ প্রকাশিত হলো, অন্যটি মহাশ্বেতা দেবীর 'বর্তিকা'য়। একটিতে ভূমিহীন সাঁওতালের জমি হারানোর বৃত্তান্ত, অন্যটিতে অবস্থাপন্ন ভূ - স্বামীর জমি অধিকারের বৃত্তান্ত।

শ্রদ্ধেয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, বিদ্যাধরীর মরা সোঁতা দেখে খুব কষ্ট লেগেছিল, নদীর চেয়েবড় তো কিছু নেই আমাদের কাছে, নদীই সভ্যতা গড়ে...''

কথার ভিতরে যে কী এক বেদনার ছোঁয়া ছিল তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। তখন আমি কুলটিকরীতে, ঝাড়গ্রাম থেকে দূরে এক ছোট জনপদে, ইলেকট্রিক নেই সেখানে, মোটামুটি ব্যবসা কেন্দ্র। মাইল ছয় দূরে সুবর্ণরেখা নদী। তিনতলা বাড়ির চিলেকোঠা ভাড়া নিয়ে থাকতাম একা একা। ছাদে দাঁড়ালে বিকেলে নদীর বালি দেখা যেত, পশ্চিমে সিংভূমের পাহাড় কখনো সখনো, খুব পরিষ্কার থাকলে শূন্যতা, বিশেষত বর্ষার পরে। নদী দেখতে যাব। অনেক দূর। কিন্তু গেলে তো হয়। ছুটির দিনে কি করি! সুধীর করণের 'সীমান্ত বাঙলার লোক যান' বইটি আমার হাতে তখন। সাতাত্তর সাল হবে। করমপরবের কাহিনী পড়ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। লোককথার আঙ্গিকটি কেমন যেন মাথায় ঢুকে গেল। এরকম তো হয়, আমি নদী দেখতে পাচ্ছি, আমাকে এক একজন মানুষপথের নিশানা ব'লে দিচ্ছে। ছিয়াত্তরে গোপীবল্লভপুরের বংশীধধরপুর গ্রামে ছিলাম। পিছনেই সুবর্ণরেখা। ধূ ধূ বালুচর, মধ্যিখানে জল। নানান এলোমেলো অনুষঙ্গ মাথায় আসছে, ঘুরে যাচ্ছে। মনে হলে লাগল যে সুবর্ণরেখা দেখেছি বংশীধরপুর গাঁয়ে পিছনে, তা বহু পশ্চিমে। এখান থেকে যে নদী দেখা যায় তা যেন আলাদা, অন্য সুবর্ণরেখা। অন্ধকারে সুবর্ণরেখা পার হয়েছিলাম। গোপীবল্লভপুরের সাতমা গ্রাম -- জাল বিষ্টির গ্রামের পাশ দিয়ে। সব মিলে মিশে গেল 'গাঁওবুড়ো' গল্পে। করম ঠাকুরের খোঁজে যাচ্ছিল ধর্মু আর কর্মু দুই ভাই। গাঁওবুড়োর ফকিরচাঁদ যাচ্ছে সুবর্ণরেখা ধারে কন্যাডিহা গ্রামে বড়বাবুর খোঁজে।

গল্পটি প্রকাশের পর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে তাঁর 'কুবেরের বিষয় আশায়' -- উপন্যাসটি উপহার দিয়েছিলেন। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসা করেছিলেন খুব। মহাশ্বেতা দেবি ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন শ্যামল রায় নামে আমার এক অগ্রজপ্রতিম শিল্পী এবং লেখকের মাধ্যমে। এসব জীবনের সবচেয়ে মধুর মুহূর্ত। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বুকেরের বিশয় আশয়' আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়ে আমাকে জানিয়ো, কোথায় কোথায় কেমন লেগেছে...।' আমি নত হয়ে প্রাণম করেছিলাম তাঁকে। ভাবতে এখন ভালো লাগে। সাতাত্তরের কথা।

'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' গ্রন্থটি আমাদের সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বইটি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। শিক্ষার্থীর মত পড়তাম। লোক জীবনের সূত্রগুলি কীভাবে সন্ধান করতে হয় তার এক ধরণের আন্দাজ পেয়ে গিয়েছিলাম ওই বই থেকে।

তখন হলদিয়ার কাছে বালুঘাটায় থাকতাম। অফিসের গায়ে হলদি নদী। ভাঁটার সময় নদীর বুক খালি হয়ে যায়। চর বেরিয়েপড়ে। তমলুক চলে যেতাম মাঝে মধ্যে। রাত্রিবাসও হতো এখানে ওখানে। হাঁটতে হাঁটতে রূপনারায়ণের তীরে, জাহাজ ঘাটায়, বর্গভীমা মন্দিরে। যেখানে জাহাজ থামত তাম্রলিপ্ত বন্দরে, সেখানে দেখছি ধান জমি, বন্দর শেষ হয়ে গেছে। একদিন বালুঘাটায় স্থানীয় মানুষের মুখে শুনলাম নদীর মোহনায় চর পড়েছে, আগুন মারির চরের একজন আমাকে নিয়ে যাবে বলল। হলদিয়া বহুদিন ধরে হচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে না। কেউ বলছে নদীর গভীরতা কমছে। কেউ বলছে -- মিষ্টি জল নেই, টাউনশিপ থাকবে না। হলদিয়া রেল-স্টেশনটিরই বা কী অবস্থা। এসব দেখতে দেখতে, নানান কথা শুনতে শুনতে আমার ভিতরেও যেন কেমন ভয় ঢুকে গিয়েছিল, ভাবতাম এই বন্দরও মরে যাবে ঠিক এ যেন আর এক তাম্রলিপ্ত। এহলো ৭৯-৮০র কথা। তার আগের বছর প্রলংকরী বন্যা গেছে। অতি বৃষ্টি গেছে। ঊনআশি সালে বৃষ্টি নেই। খরা। ধান মরে যাচ্ছে আশপাশে। চাষীদের কথা শুনতে হতো তাদের কাছেই। একজন আবার খবর দিল, ভূমিকম্প হতে পারে। পূর্বাঞ্চল জুড়ে, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাঙলাকে নিয়ে একটাভূমিকম্পের রেঞ্জ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা ছোট উপন্যাস লিখি, 'ভয়'। পরে তা বই হয়ে বেরোনোর সময় নাম পরিবর্তন করি 'আলোকবর্ষ' -- ভয়ের ভিতরে লেখা। এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল জীবনের নানা বেদনাময় মুহূর্ত।

কেউ কেউ বলেন আমার মানিক ভাল লাগে, বিভূতিভূষণ টানে না বা তারাশঙ্কর তেমন লাগে না এখন। আমার কাছে মানিক -- তারাশঙ্কর - বিভূতিভূষণ তিনজনই সমান জরী। এক একজন এক একরকম ভাবে আমাকে তাঁদের জীবনোপলব্ধির কথা শোনান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পটি যেমন প্রিয় আমার কাছে, 'তারিনী মাঝি' বা বিভূতিভূষণের 'আমোদ' নামের গল্পটিও তেমনি। আমাদের জীবনে লড়াই যেমন আছে, লড়াই-এ সামিল হওয়া আছে, তেমনি বাঁচার স্বার্থপরতাও তো কম নেই বা খুব সামান্যপাওয়াকে অসামান্য করে তোলাও স্বাভাবিক। মানুষের লড়াই যেমন সত্য স্বার্থপরতাও

সত্য। আবার অসহায়তা, সামান্য চাওয়া নিয়ে বাঁচার আনন্দও তেমনি সত্য। এগুলি তো দেখেছি। দেখছি। শহরে ও গ্রামে। জমিতে এবং তিন কামরার ফ্ল্যাটে। কলে কারখানায় - রাইটার্স বিল্ডিং - এর কেরাণী, আমলামহলে। তবে আমার কাছে অসহায় জীবন যেভাবে ছুঁয়ে যায়, অন্য কিছু ততটা নয়। একটা মানুষ মানে দু' - তিন পুষ, একশো বছরের কিংবা তারও বেশি দিনের অভিজ্ঞতার অধিকারী। আমার এমন মনে হয়। একটি লোক কথা বলতে বলতে কখনো তার পিতামহ, প্রপিতামহ হয়ে যায়, কখনো তার শৈশবের চিহ্নগুলি ফুটে ওঠে মুখের চামড়ায়। তার কণ্ঠস্বরে কখনো পাওয়া যায় পিতামহ, প্রপিতামহর ছোঁয়া। এগুলি আমাকে টানে। ভাবায়। ভাবতে ভাল লাগে এসব নিয়ে। এক এক সময় মনে হয় নিজেদের বংশতালিকার সন্ধান করি, কত পুষ আগে কে কেমন ছিলেন তা খুঁজে বার করি। 'দমবন্ধ' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। 'কর্শিনামার আগের পুষ' নামে একটি গল্প লিখতে চেষ্টা করেছিলাম...পুকুর খুঁড়তে খুঁড়তে জাহাজের মাস্তুল, একটি মাথার খুলি তার হাফ লাইফ পিরিয়ড গণনা করে জাহাজডুবির সময় নির্ণয়। একটি মানুষ বহন করে তার কুর্শিনামা ধ'রে পিছিয়ে পিছিয়ে অনেক মানুষের অভ্যাস। তার আবার তার নিজস্ব কিছু জীবনবোধও তৈরি করে সমাজ পরিপার্শ্ব। তাতে সে আলাদা, নিজের মত। তার সংগ্রাম, তার স্বার্থপরতা সব সত্য। এভাবে একটি জাতি, এভাবে সারা পৃথিবী।

দীঘায় একটি ছোট হোটেলে এক বছর ছিলাম ভাড়ায়। সঙ্গী হলো হোটেলের মালিক, ঠাকুর, ঠাকুর গিন্নি, আর সন্ধ্যেয় জমা হওয়া কিছু জেলে, মাছধরার লঞ্চের খালাসী। শেষ পর্যন্ত এক ফরাসী হিপি সাহেবও। নরকগুলজার। দাদুর দস্তানায় ডুকে পড়েছি সবাই একে একে। হোটেল মালিক মানুষটি খুব ভাল, ব্যবসা ছাড়া সব বোঝেন, নেশা ভাঙ, আড্ডা, অবৈধ প্রেম। তাঁর ছিল একটি টাট্টুঘোড়া। তাতে চেপে মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে হোটেল পর্যন্ত আসতেন। বাড়ির কাছের এক গ্রামে। বালির ঢেউ পেরিয়ে যেতে হয়। আর ছিল এক লাইসেন্স খোয়ানো বাস ড্রাইভার, হোটেল মালিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

হোটেল মালিকের আসল সমস্যা ছিল ওই টাট্টুটিকে নিয়ে। সে ছিল ভবঘুরে। পালিয়ে যেত লাগাম ছিঁড়ে। দীঘা চন্দনেশ্বর পেরিয়ে অনেক দূর, সেই একচরে, সুবর্ণরেখা যেখানে মিশেছে সমুদ্রে। চরে ঘাস খেতে আশপাশে থেকে আসত আরো। অনেক পলাতক ঘোড়া। কখনো চরে যেত, কখনো অন্য কোথাও, খোয়াড়ে আটকা পড়ত কারো জমিতে ঢুকে প'ড়ে। হোটেল মালিক বছরের মাস চার ব্যস্ত থাকত তার পলাতক টাট্টুটিকে খুঁজে বার করার জন্য। একরাতে ঘোড়াটিকে নিয়ে ফিরেও এল হোটেল মালিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইসেন্স খোয়ানো ড্রাইভার। বেঁধে রাখল আমার ঘরের পাশের জমিতে। বর্ষাকাল, মেঘ আছে, চাঁদও আছে। পা ছুঁড়ছে টাট্টু। আমি জানালা খুলে দেখছি, সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আবার পালাল শেষ রাতে। তার ভিতরে যেন অরণ্যচারী বুনো ঘোড়ার রক্ত জেগে উঠত মাঝে মধ্যে, বিশেষত প্রকৃতি যখন অবলীলায় রূপ বদলে ফেলে, তার দিকে তাকিয়ে। বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে সে যেন বহুপুরষ আগের উদ্দামতা ফিরে পেত। জ্যাক লণ্ডনের 'কল অব দ্য ওয়াইল্ড' এর একটি অসাধারণ মুহূর্তে মনে গেঁথে আছে। গভীর নির্জন মেপ্রদেশে রাতে এজটানা ভারবাহী কুকুরগুলি পাণ্ডুর চাঁদের দিকে চেয়ে এক নাগাড়ে ক্রন্দন করে যাচ্ছে, বিলাপ করে যাচ্ছে, দূরে নেকড়ের পাল জ্বলন্ত চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে স্বর্ণ সন্ধানী মানুষগুলির তাঁবুর দিকে। এজটানা কুকুরগুলোর বিলাপের ভিতরে যেন জেগে উঠতে লাগল শত শত বছর আগের শৌর্য হারানোর বেদনায়। নেকড়ের পালকে দেখে তাদেরমনে পড়তে লাগল পূর্বপুষের জীবনের সেই অনন্য মুহূর্তগুলির স্মৃতি। তারাতো নেকড়ের জীবন থেকে পতিত হয়েছে পরিণত হয়েছে এজ টানা কুকুরে। জীবনের এই বেদনার চিহ যেন আমি ওই কৃশকায় টাট্টু ঘোড়াটির ভিতরে খুঁজে পেয়েছিলাম। সে পালাত, কেননা তার রক্তে জেগে উঠত অরণ্যচারী পূর্ব - জীবনের স্মৃতি । এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে ১৯৮২ সালে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় একটি ছোট উপন্যাস লিখি 'বিভ্রম ' নামে। পরে ১৯৯৯ সালে আরও বড় আকারে 'অচরিত' নামে বই হয়ে বের হয়।

এই বেদনা, এই অসহায়তা, গত জন্মের স্মৃতির মত এইসব ইতিহাস, আমাকে টানে, এর সঙ্গে জাতিস্মরবাদের, অলৌকিকতার কোন সম্পর্ক নেই। এ হলো মানুষের আসল ইতিহাস। একজন কেরাণী খুব নুয়ে হাঁটে, অন্যজন হাঁটে বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে। একজন ঘুষখোর হয়; অন্যজন সহজ সৎ, পরিচ্ছন্ন। এ সবের ভিতরে কী তার পূর্বপুষের চিহ্নগুলি লুকিয়ে নেই। আবার পরিপার্শ্ব তার বেড়ে ওঠার গতি - প্রকৃতিও কী লুকিয়ে নেই।

একটি বিষয় মনে পড়ে। কোন একটি বিষয় হঠাৎ যেন আমার চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ভূমিকম্প। চর্চা করতে করতেনিজেই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি, পায়ের নিচের মাটি দুলে উঠবে। যেমন বাগুইআটি কেষ্টপুরের মাঠের উপর দিয়ে সন্ধ্যায় হাঁটতেহঠাৎ মনে হলো সাইবেরিয়া পাখি আগে আসত। এখন জলাশয়, মাছের ভেড়ি নেই, তাই আসে না। যদি ভুল করে চলে আসে। এসেছিল হয়ত পরের বছর, আগের বছর শীতে কাটিয়ে গেল জলে, পরের বছর এসে দেখল মাঠ। জল নেই। হয়েছিল তো। অন্ধকারে আকাশে তাকিয়ে মনে হলো, হ্যাঁ তাই ওই যেন সাইবেরিয়ার হাঁস ... বিভ্রান্ত হয়ে প াক খাচ্ছে আকাশে।

চর জমি। আগে নদী ছিল। এখন এপার -ওপার মেশানো। মানুষ ওপারের গ্রামকে এখনো ওপার বলে। বংশ পরম্পরায় স্মৃতি বহন করছে সে। আমি আমার পিতামহ, প্রপিতামহর রক্ত বহন করছি। রক্তের ভিতরে তাঁদের অভ্যাস। তাঁদের অভিজ্ঞতা। আহা, যদি মনে পড়ে যেত সেই একশো বছর আগের কোন ঘটনা, স্মৃতি। যদি আমি তাঁর চেহারার আদল পেতে পারি, তাঁর অভিজ্ঞতার কানাকড়ি পাব না কেন? মে প্রদেশে ম্লেজবাহী কুকুরগুলোর তো মনে পড়ে গিয়েছিল অরণ্যচারী নেকড়ে জীবনের স্মৃতি বা দীঘার সেই টাট্টুর ভিতরে জেগে উঠেছিল প্রাচীন অভ্যাস।

এ সবের কোন সুরাহা নেই, কিন্তু মনে হয়। আর হলেই বুঝতে পারি শোষণ শাসন সবেরই একটা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে জোড়া সত্য আছে। আমাকে তা ভাঙতে হয় খুব কষ্টে। আমার প্র-পিতামহ যদি খুব আয়েশে জীবন কাটিয়ে গিয়ে থাকেন, আমি আয়েশ খুঁজতে চাইব যেন রক্তের অভ্যেস। আমি বদলালেও কখনো আমার আচরণে, কণ্ঠস্বরে প্র-পিতামহ ভর করবেন। ক্রমশ প্র-পিতামহ মুছে যাবেন, জেগে উঠব আমি আমার সন্তানের ভিতর, সে তার সন্তানের ভিতর। এভাবেই বহুদিন ল াগে মানুষকে সভ্য হতে। তাই বোধ হয় এখনো খুব সামান্য মানুষের ভিতর ক্ষমাসুন্দর, নমনীয় আচরণ খুঁজে পাওয়া যায়, আবার নামী জনদরদীর ভিতরে পাওয়া যায় হিটলারের ছায়া। হিটলারের সন্তানদের যীশুখ্রীষ্ট হয়ে উঠতে অনেক বছর লাগবে। তবে শিক্ষা, সমাজ মানুষকে অনেকটা স্বাভাবিক করে তোলে, রক্তের অভ্যাস তাতে ঢাকা পড়তে পারে হয়ত। এও এক কুর্শিনামার কথা। ভুল হতে পারে, কিন্তু এমন চিন্তা মাথায় ঢোকে মাঝে মধ্যে।

লেখার বিষয়টা হলো আমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা আছে এখানে, এই নয় পাহাড়ীতে একটা মেলা হোক। কিছু হোক। তেতাল্লিশ বছরে তো হয়নি কিছুই। বলতে লাগলাম মাস্টারমশায় রবিলোচন বাবুকে, পঞ্চায়েতের মেম্বার প্রফুল্লবাবুকে। কিন্তু কিস্যু হলো না। কেন মশাই, নিদেনপক্ষে এই শালতোড়ায় একটা ট্যুরিস্ট লজ করে বাইরের মানুষ তো ডেকে আনা যেতে পারে, কী সুন্দর পাহাড়েঘেরা।

তা হয়

আলোচনা চলতে চলতে একদিন ফুরিয়ে গেল। বুঝলাম হবে না। রাজনৈতিক দল রাজি নয়। অথচ আমার ইচ্ছে জায়গ াটারকথা জানুক সকলে। কীভাবে জানবে। কেন যদি মেলা বসে। সত্যি বড় মেলাও তো হয়না এখানে। কেঁদুলির মত যদি হতো। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার মত যদি উৎসব লাগত এখানে। সারাবছর শালতোড়া একই রকম! খুব চেষ্টা করল াম। যদি রাজি হয়, লেগে পড়তে পারি। আমার তরফে যা করার করব।

হলো না। তখন আমার অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হলো 'সহস্র মাদল' নামে একটি উপন্যাসে। মেলা বসাচেছন পাহাড়িতে কিছু ম ানুষ কীর্তি রেখে যাওয়া তাদের বাসনা। ভোবেই লিখতে চেষ্টা করি। লেখা হয় এভাবেই। নিজেকে ইনভলভ্ড করিয়ে দিতে না পারলে কলম সরে না।

'মেলার দিকে ঘর' গল্পটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের খুব ভাল লেগেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন অচেনা যুবককে, কোথায় থা কি, কি করি। ভরসা পেয়েছিলাম যেন!

প্রয়াত সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রাজ কাহিনী' গল্পটি পূজো সংখ্যা 'পরিচয়ে' ছেপেছিলেন ছিয়াত্তর সালে। আমাকে এ ঘটনাও প্রেরণা দিয়েছিল। মনে হয়েছিল লিখতে হয়ত পারব।

'মাঠ ভেঙে কালপুষ' বেরোল আটাত্তরের জুনে। অনেকে এখনো বলেন ভাল বই। 'দানপত্র' ছিয়াত্তর সালে। আমাকে এ ঘটনাও প্রেরণা দিয়েছিল। মনে হয়েছিল লিখতে হয়ত পারব।

কিন্তু যখন শৈবাল মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, আফফসার আমেদ, রাধান াথ মণ্ডল, দীপঙ্কর দাস, ঝড়েশ্বর, শিবতোষ, স্বপ্নময়, আবুল বাশারকে পড়ি, মনে হয় ওঁরা যেন অনেক বেশি করে জানেন ম

ানুষ। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন প্রশাসনের নাড়ি নক্ষত্র। অগ্রজ লেখক রমানাথ রায়ের ভঙ্গীটিও আমার খুব প্রিয়। এঁরা আমাকে সংশোধিত হতে সাহায্য করেন প্রতি মুহূর্তে। শৈবালের 'দেওয়ালের লিখন', সুব্রত-র 'পৌর্ণমাসী', বাশারের 'সঈদাবাঈ' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আফসারের 'আত্মপরিচয়' -এর একটি অংশ পড়ে বিস্মিত হয়েছি, যেভাবে বিস্মিত হই গ্রামগঞ্জের অচেনা জীবনের সরল সত্যটিকে হঠাৎ অনুভব করে।

একটি লেখা হলো আগের লেখার সংশোধন। আগের লেখার অপূর্ণতাকে দুর করার প্রয়াস। ভাল গল্প পড়া মানে নিজের উপলব্ধির জগতকে আরো বিস্তীর্ণ করে তোলা। নিজের জগতকে বাড়িয়ে তোলা। তা যেমন বিমল কর, রমাপদ চৌধুরীরা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী করেছেন, তেমনি আমার এখানকার প্রিয় লেখকরাও। শিবতোষের 'কিছু মানুষ কিছু গ ছাগল' গল্পটির কথা ভাবি না কেন, ও লেখা খুব কঠিন। কঠিন 'আটঘরার মহিম হালদার' (রাধানাথ) 'বাবার স্মৃতি' (নলিনী বেরা) বা 'দেবাংশী' (অভিজিৎ সেন)র মত গল্প লেখাও।

লেখাও ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। আমাকে সতর্ক করেছেন এঁরা।

সতর্ক করতে এগিয়ে আসছেন অনিল ঘড়াই, সুদেবসুন্দর মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ বা তৃণাঞ্জনরাও। ফলে আমাকে ভাবতে হচ্ছে আরো। যেতে হচ্ছে অভিজ্ঞতার, অনুভূতির গভীরে নিজের মান, অপমানের কথা ভাবতে হচ্ছে। তা নিয়েও তো লেখা যায়। যা প্রাপ্য নয়, গল্পে তা এসে পড়ে কখনো কখনো। নিজের বালবাসা আবেগ নিয়ে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় কোনও এক লেখক বন্ধুর কাছে গিয়ে নিদাণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। পরে ভেবেছি এও লেখার বিষয়। আবার যখন 'অষ্ট বাউরির মেলা' বেরোনোর পর সুব্রতর চিঠি পাই শালতোড়ায় বসে তখন আপ্লুত হই, ডানার শব্দ' পড়ে অচেনা পাঁচু রায় তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা জানান সম্পাদকের দপ্তরে তখন সাহস পাই। 'ডানার শব্দ' ও তো নিজের ইনভলমেন্টের কাহিনী। নলিনী বেরা যখন আমার পাণ্ডুলিপি শুনতে, তাঁর পাণ্ডুলিপি শোনাতে, আমার বাড়িতে ছুটে আসেন বা তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন, টান অনুভব করি ভীষণ। দুজনে পরস্পরের দ্বারা সমৃদ্ধ হওযার এই তো প্রকৃষ্ট উপায়।

ভাবতে হচ্ছে খুব। যা নিয়ে লেখা যায় না ভাবতাম, এখন দেখছি তা নিয়েই লিখতে ভাল লাগে। অপমানিত হওয়াও লেখকের পক্ষে যেন জরি।

কেউ কেউ বলেন, গ্রাম - গঞ্জ, জমি - মাটি তুমি ছাড়ো।

আমি কী করে ছাড়ি। গ্রাম - গঞ্জ জমি মাটি যে আমাকে ছাড়ে না। ছাড়ে না পরিবার, স্মৃতি, বাল্যকাল, আমার এলাকা বেলগাছিয়া, যার পিচরাস্তা একটু খুঁড়ে দিতে পারলেই সুন্দরবনের মাটির গন্ধ। ট্রাম লাইন, বর্ষায় জমা জল, টালা পার্ক, শৈশবের বন্ধুরা, কেউ আমাকে ছাড়ে না। সবাই আসছে গল্পে। কে যেন ফুটপাত খুঁড়ে একটি ঝাউগাছ পুঁতে দিয়েছিল, তা যেন মহীরূহ। শিকড় চালাচ্ছে মাটিতে। আকাশে মাথা তুলেই কলকাতাকে ভুলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। কেউ ছাড়ে না, না কলকাতা, না গ্রামগঞ্জ, সুবর্ণরেখা নদী, দামোদর নদ ব্যারেজ, শালতোড়ার পাহাড় টিলা। কলকাতায় ফিরেই ভাল নাটক, ভাল সিনেমা, ভাল বন্ধু, লেখক বন্ধু। এঁরা সকলেই আমার লেখায় বিষয়। যে লেখা দু'জনে ভাল বললেই আমি নিশ্চিন্ত, আমার মা এবং আমার অগ্রজ, যার নাটক পাঠও আমার কাছে একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com